অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

মাথায় কোনো গল্প আসছে না। কী করি? আর তখনই তিনি এসে সামনে দাঁড়ান। অর্থাৎ নিরাময়দার কথা মনে হয়, ঈশার কথা মনে হয়। তারা সশরীরে যেন হাজির।

তাদের তো সশরীরে হাজির হবার কথা না। সেই কবে পুব-বাংলার এক জলা জায়গায় তাদের সঙ্গে আমার দেখা—দেখা বলা হয়তো ঠিক হবে না। কারণ তাদের শ্যেন নজর এড়িয়ে কোনো কুকাজ করাই আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। নিরাময়দাকে বাড়ির কাজের লোকও বলা যায়, আবার অভিভাবকও বলা যায়। আমাদের শৈশবে নিরাময়দা যে কত সম্ভব-অসম্ভবের গল্প বলে মনমেজাজ ভালো করে দিতেন এবং তার কথা ভাবলেই মগজে নানা গল্প তৈরি হয়। তাকে নিয়ে গল্পও লিখেছি, তবে ঈশার গল্প শেষ হয় না। বাড়িতে ঈশার আসার কথা থাকলেই আমি বড়ো অস্থির হয়ে পড়ি।

যেমন একবার নিরাময়দাকে কিছুতেই রাজি করাতে পারছিলাম না। তিনি ঢাইন মাছ শিকারে নদীতে যাবেন। আমরাও যাব। আমরা বলতে বড়দা, মেজদা আর ছোটদা। যে সে নদী না। মেঘনা নদী—বিশাল বিপুল জলরাশি নিয়ে সে কোথায় যে ছুটছে! বর্ষায় নদীর দু-পার দেখা যায় না। আর তার তরঙ্গমালার কী বাহার!

সেই তরঙ্গমালায় পড়ে গেলে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। তবু কেন যে দেখার বাহার, বাহার অর্থাৎ জীবনের বাহার—স্টিমার, গাদাবোট, একমাল্লা, দোমাল্লা নৌকা, খাসি নৌকাও মেলা, পাল তুলে দিয়ে কোথায় যে তারা যায়।

গয়না নৌকাও থাকে। কলের গান বাজে-নদী তুমি কোথায় যাওরে। বর্ষায় আত্মীয়জনেরা আসেন। শহর থেকে দূর গ্রাম থেকে, পঁচিশ-তিরিশ ক্রোশ কোনো ব্যাপারই নয়। বড়ো পিসি ছোট পিসি, মামা-মামিরাও আসেন। আর আসে বড়ো পিসির মেয়ে ঈশা। সে আমাদেরই বয়সি।

নদীর পারে আমরা বড়ো হয়েছি।

ঠিক নদীর পারে বলা যাবে না। নদী থেকে এক ক্রোশ দূরে।

আমাদের গ্রামের মাঠ পার হলেই খোপেরবাগ, তারপর আর একখানা মাঠ, সেই মাঠে পড়লেই সংসারদি, তারপরই দামোদরদির মাঠ। সেখানে নদীর পাড়ে ডাঙার মতো জায়গায় শ্মশান এবং বটগাছ—যে সে বটগাছ নয়। বিশাল অশ্বত্থ গাছ বলাই ভালো—তার নীচে জটাজুটধারী এক মহাক্ষেপা পাগল, গৌরবর্ণ, কপালে সিঁদুর, বম বম ভোলানাথ ত্রিশূল হাতে নিয়ে বসে আছেন—নিশুতি রাতে শবদাহ হলে তার কম্বুকণ্ঠে চিৎকার জয় মা জগদম্বা, কারণ গাছের নীচে একটি মন্দিরে তিনি বসবাস করেন। সকালে জগদম্বার অন্নভোগ হয়। ভৈরবী লীলাবতী শুদ্ধ বস্ত্রে খিচুড়ি পায়েস লাবড়ার ভোগ দেন—এবং নিরাময়দার মুখেই সব শোনা —আমাদের অবশ্য সেখানে যাওয়া হয়নি। ঢাইন শিকার উপলক্ষে যদি সেই আশ্রম দেখার সৌভাগ্য হয়।

বাড়ির ছোটোকর্তার মেজাজ খারাপ। সকাল থেকে নিরাময়দাকে শাসাচ্ছেন, কাজকাম ফেলে চললি নদীতে। বড়দির আসার কথা–পূজার ছুটি পড়লেই তারা রওনা হবেন।

তারা মানে ঈশাও সঙ্গে থাকে। শহরের মেয়ে ঈশা। চঞ্চল, কৌতূহলী এবং বন্যপ্রকৃতির। আর আমাদের মধ্যে ঈশা এলে আশ্চর্য এক প্রাণের সাড়া পড়ে যায়। আমরা তিন জনই পানাস হাইস্কুলের উঁচু ক্লাশের ছাত্র। তাকে নিয়ে আমাদের মধ্যে বিচিত্র সব মান-অভিমানের পালাও জমে ওঠে।

তখন তাঁর এককথা, কী করি কন কর্তা! মাছের নেশা যার আছে সে জানে। শ্রাবণ-ভাদ্রি নদীর উজানে ঢাইন মাছেরা ঝাঁকে ঝাঁকে উঠে আসে। মাছেরা এই 'জো' আগামী পূর্ণিমা পর্যন্ত থাকবে। নদীর অতলে তেনারা উঠে আসছেন।

ছোটোকর্তার শাসানি থামছে না।—কাজকাম সেরে যাবি। খবরদার, অচল ভোলা উমা কেউ যেন আবার নৌকায় গিয়ে বসে না থাকে! ওদের সঙ্গে নিবি না। জ্বরজ্বালা হলে কে দেখবে। পড়ার ক্ষতি, একবারে তো একটাও পাশ করতে পারে না।

বড়দা তখন আমার দিকে তাকিয়ে বলল, হয়ে গেল। ছোটোকাকা খেপে আছে।

আমরা পশ্চিমের ঘরে পড়ছি, কাকার হম্বিতম্বিও কানে আসছে। পূজার ছুটি পড়ে গেলেই ঈশা স্টিমারে না হয় নৌকায় চলে আসবে।

তখনও নিরাময়দার বিনয়ের শেষ নাই।– আজ্ঞে কর্তা আমি কী পাগল। জল এখন নামছে। বিল খাল থেকে সব জল নদীতে নামছে। পোকামাকড় সব জলে ভেসে যাচ্ছে।

মাছেরা গন্ধ পায়, ঢাইন মাছেরা ঝাঁকে ঝাঁকে উঠে আসছে। বড়ো বড়ো হা করে গিলছে সব। পাতালপুরীতে রাজসূয়যজ্ঞ শুরু হয়ে গেছে জানেন!

কাকা পুকুরে ডুব দিতে যাচ্ছেন। তাঁর সন্ধ্যা-আহ্নিক আছে, ঠাকুর পূজা আছে। কোথায় কোন যজমান বাড়িতে বিবাহ আছে। সকাল থেকেই তিনি ব্যস্ত। কাকিমা জেঠিমারা হেঁসেলে ব্যস্ত। ঠাকুমার ঘরে ঠাকুরমা পূজার বাসনকোসন বের করে দিচ্ছেন। সবাই নিজের কাজে ব্যস্ত—অথচ আমাদের স্কুল ছুটি, সারাটা দিন কী যে করি! নিরাময়দা ঢাইন শিকারে গেলে কথা দিয়েছিল আমাদের নিয়ে যাবেন। শুধু তাকে দু-কৌটা আরশোলা ধরে দিতে হবে। এখন তিনি কাকার কাছে কী ভালোমানুষ! মেজদা ক্ষোভে ফুঁসছে। বইখাতা ছুড়ে ফেলে একেবারে উঠোনে নেমে গেল। মেজদা যে গোয়ারগোবিন্দ বাড়ির সবাই জানে। নিরাময়দাও জানে।

নিরাময়দা তুমি আমাদের নিয়ে যাবে না?

তিনি তখন টোনসুতোয় গাবের কষ খাওয়াচ্ছেন। ঘাটের গাবগাছে সুতোর একমাথা গিঁট দিয়ে বাঁধা। অন্য প্রান্ত বাড়ির উঠোনের অড়হড় গাছের ডালে বেঁধে মৌজ করছেন। বঁড়শির গিঁট টেনে দেখছেন। চার-পাঁচটা বোয়ালে বঁড়শি দশির বাজার থেকে কিনে এনে তাদের দেখিয়েছেন। বঁড়শির কী তেজ! একবার গিলে ফেললে মাছের আর রক্ষে থাকবে না।

তুমি আমাদের নিয়ে যাবে কিনা বলো। কথার খেলাপ করবে না!

কোথায়!

আরে অদ্ভুত কথা বলছে তো!

বললে যে আরশোলা দু-কৌটা ধরে দিলে আমাদের মাছ শিকারে নিয়ে যাবে!

ছোটোকর্তা রাজি না। তোরা ছেলেমানুষ, মাছ ধরার ধকল সহ্য হবে না। পড়াশোনার ক্ষতি। পাশ না করলে খাবি কী!

তোমার কথা মতো আমরা দু-কৌটা আরশোলা ধরে দিলাম–

তোরা গেলে আমার কত সুবিধা। তারাপদ সকাল সকাল চলে আসবে বলেছে। সেই নদীর উজানে নৌকা তুলে নিয়ে যাবে। তারা পারবি না।

বড়দা বলল, আমরা পারব। নৌকায় আমরা স্কুলে যাই। সেও তো কত লম্বা রাস্তা। আমরা পারব না কেন?

ঠিক আছে। তোরা পারবি। তোরা বড়ো হয়ে গেছিস। ছোটোকর্তাকে বুঝিয়ে বললেই হবে। যা তো নৌকার পাটতনে সব সরঞ্জাম তুলে ফেল—চানটান করে নে। যদি পারি তোর পিসিকে ঈশাদিকে ফেরার সময় ঘাটে তুলে নেব।

মেজদা বলল, কাকা খেপে আছে। পিসির পাত্তা নেই। শহর থেকে শাড়ি, সায়া, জামাকাপড় নিয়ে আসে পিসি পিসেমশাই। আর ঈশাদি একাই একশো। পিসি পিসেমশাইর জন্য বাড়ির সবাই অপেক্ষা করে থাকে। তাদের পাত্তা নেই। খেপে তো থাকবেনই। পূজার জামাকাপড় বলে কথা! তাকে তুমি রাজি করাতে পারবে না। ফিরে এলে আমাদের সব কটাকে পেটাবে।

ঠিক আছে। আমি তো আছি। কর্তা ছাড়া আর কি কেউ বাড়িতে থাকে না! ঠাইনদিকে বললেই হবে।

ঠাইনদি অর্থাৎ আমাদের ঠাকুরমা। তিনি রাজি হলে কারও কিছু করার নেই। এই মাছ ধরা এক দুঃসাহসিক অভিযান। কোষা নৌকার পাটাতনে বসে থাকা, ঝড়বৃষ্টি আছে এবং ধাপে ধাপে নদীর জল পাগল হয়ে থাকে। মাছ পাগল হয়ে থাকে। বর্ষায় ঢাইন মাছের গর্ভসঞ্চার হয়। কারে খায় কারে রাখে ঠিক থাকে না। এই সময় এক একটা ঢাইন মাছ হাঙরের মতো বিশাল আকারের হয়। রুপোলি মাছ, মুখ কুঁচলো এবং টকটকে গভীর লাল, মাছ যদি বঁড়শিতে লেগে যায়, তাকে কবজা করতেই রাত কাবার হয়ে যেতে পারে। শিকারে গেলেই হয় না, তিথিনক্ষত্র দেখে বের হতে হয়। নিরাময়দা সব কাজই সুচারুভাবে সম্পন্ন করেছেন। কোষা নৌকার গলুইতে বড়ো বড়ো সিঁদুরের টিপ দিয়েছেন, বিশকরম বলে শুধু রওনা হয়ে যাওয়া।

নদীতে যাচ্ছি শুনে বাড়িতেও শোরগোল পড়ে গেল। মা জেঠিমারাও তেতে আছেন। নিরাময় তুই কী পাগল! এই ভাদ্রমাসের গরমে—রোদে ঝড়বৃষ্টিতে রওনা হলি!

আমার কী দোষ! ঠাইনদি যে কইল, নিয়া যা, নদীতে সবাই মাছ ধরতে যায়, আমার নাতিরা কী দোষ করল। পূজার ছুটি পড়ে গেছে—ঈশা এলে ওদের মজা কত বোঝ না!

আর কথা নাই। কথা বললেই সাতকাহন, নিরাময়দা শুধু বললেন, দেরি হইলে চিন্তা কইরেন না। মনে করবেন বঁড়শিতে মাছ আটকাইছে।

ঠাকুরমা বলল, আশ্রমে গিয়া ট্যাবারে কবি বিনোদিনী দিদি পাঠাইছে। সে তো শুনেছি দৈব লাভ করেছে। আমার তিন নাতির মাথায় যেন দেবী জগদম্বার আশীর্বাদী ফুল দেয়। দৈব বলেই জন্ম-মৃত্যু। কার জীবন কে যে নেয়। এত আতুপাতু ভালো না। নাতিরা বড়ো হচ্ছে, কত কিছু বুঝতে শিখেছে, তাদের বাধা দিতে নেই।

বেলা পড়তেই রওনা হওয়া গেল।

এই সময় জলে টান ধরে। চার পাশ এত দিন বর্ষায় মাঠঘাট নদীনালা সব ডুবে ছিল। নৌকা বাইতে বিশেষ কষ্ট ছিল না। জলে টান ধরায় নৌকায় লগি মারতে কষ্ট। নিরাময়দা সাহসী মানুষ, ভূতপ্রেতে বিশ্বাস আছে—তবে তিনি মনে করেন ভূতপ্রেত মানুষের কোনো অনিষ্ট করে না। মানুষই মানুষের অনিষ্ট করে, আবার উপকারও করে। নিরাময়দার এক কথা, আরে পুণ্ডরীকাক্ষ ঠাকুর যার সহায় তার ভয় কীসের।

আসলে ঠাকুমার ট্যাবা এখন শ্মশানে সিদ্ধি লাভ করে যে পুণ্ডরীকাক্ষ হয়ে গেছেন সেকথা আমাদের জানা ছিল না। মেজদাই বলল, বড়ো খটকা লাগছে।

কীসের খটকা।

ট্যাবা বলল কেন ঠাকুমা। ট্যাবা নাম হয় নাকি?

আরে আরে ঠাকুর তো ঠাকুমার দেশের লোক। ট্যাবা যে শেষে পুণ্ডরীকাক্ষ হয়ে যাবেন তিনিও জানতেন না। ঠাকুর তোদের নাকি একবার দেখতে চেয়েছিলেন। বিনোদিনী দিদির নাতিরা কত বড়ো হয়েছে দেখার খুব সাধ। এবারে মাছ শিকারও হবে, ঠাকুরের

মনোবাঞ্ছাও পূরণ হবে। বুঝলি কিছু। বললাম, আমার মন ভালো না, ঈশা যে কবে আসবে! কেমন পাগল পাগল লাগছে। ঠাইনদি এক কথায় রাজি হয়ে গেল। ঠাকুরের আশ্রমে রাত যাপন করব শুনেই ঠাইনদি এক কথায় রাজি হয়ে গেল। —আশ্রমে কোনো বিপদ-আপদ থাকে না জানিস। তা ছাড়া ভৈরবী ঠাকরুন দেখবি তোদের কত আদরযত্ন করে খাওয়ায়। ঠাকুর আবার নদীরও দেবতা—তার প্রিয়জনদের অনিষ্ট হয় এমন কোনো কাজই করতে নদী সাহস পাবে না।

ঈশা এলে আমরা যে তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি, ঈশার পূজার ছুটি হয়তো পড়েনি, গ্রীষ্মের ছুটিতে আসতে পারে না, অনেকটা পথ হাঁটতে হয়। বর্ষায় নৌকা এলে ঘাটে লাগে—বড়োই সোহাগি মেয়ে ঈশা। আমি ঈশার কথাই ভাবছিলাম। কী সুন্দর মেয়ে, ফ্রক গায়ে দেয়। আমরা লম্বায় এখনো সমান সমান। সে এলেই আমার পাশে দাঁড়িয়ে মাপবে। সে কত লম্বা হয়েছে।

আমাদের কোষানৌকা তখন পদ্ম আর শাপলা শালুকের বিলে ঢুকে গেছে। নদীতে সূর্য ডুবছে। এই বিল পার হলেই সংসারদির পুল। তারপরই সেই ডাঙা দেখা যাবে। বড়দা হালে বসে আছে। মেজদা আর নিরাময়দা বৈঠা মেরে পদ্মবন পার হয়ে যাচ্ছে। আমি চুপচাপ বসে আছি পাটাতনে—চারপাশে জলাভূমি আর অজস্র পাখির কলরব। তারা এতক্ষণ বিলের জলে ওড়াউড়ি করছিল। পোকামাকড় এবং মাছ ভেসে উঠলে, যেমন কিছু চিল এবং তার সঙ্গে দু-চারটি ঈগল পাখিও আছে, বিলের জল থেকে একটা ঈগল বিশাল ডানা মেলে জল থেকে ঝুপ করে তুলে নিয়েছে অতিকায় একটা মাছ এবং উড়ছে। জলা জায়গা বলে কোনো গাছপালা চোখে পড়ছে না। দূরের আশ্রমে দেখা

যাচ্ছে, সব বড়ো বড়ো বৃক্ষ, এই তাজ্জব করা জায়গায় এসে কেমন একটা আশ্চর্য মোহ তৈরি হয়। পুণ্ডরীকাক্ষ কথাটার অর্থ কী জানতে ইচ্ছে হয়।

নিরাময়দা বললেন, আর বেশি দূর না। সূর্য ডুবতে না ডুবতেই আশ্রমের ডাঙ্গা পেয়ে যাব। কী রে ভোলা, পাটাতনে বসে যে একেবারে ভাবলু বনে গেলি!

আমি যে ঈশার কথা ভাবছিলাম নিরাময়দা হয়তো টের পেয়ে গেছেন। আমি সোজা হয়ে বসলাম।

বল। মনে হয় কোনো সংশয়ে ভুগছিস?

বললাম, না মানে—

আরে মানে মানে করিস না। সব তাঁরই কৃপা।

কৃপা কেন।

তিনি তো ধরণীর তাবৎ সুখ-দূঃখের অধিকারী।

আচ্ছা কাকা, পুণ্ডরীকাক্ষ কাকে বলে?

বিষ্ণু অবতার।

এত খবর তুমি দাও, এত বড়ো একজন দেবতা নদীর পারে আশ্রম বানিয়ে বসে আছে বলোনি তো। আমার কথাবার্তায় ঈশাকে সম্পূর্ণ আড়াল করে গেলাম।

তোরা ছেলেমানুষ, কেবল স্কুল আর বিদ্যাশিক্ষা আর বছর বছর ফেলমারা। তার বাইরেও এক বড়ো জগৎ বিদ্যমান—সোজা হয়ে বোস। সব ঠিকঠাক আছে, কপালে সব লেখা থাকে। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিন অবতার বুঝলি, আমাদের ঠাকুর বিষ্ণুর অংশ। আশ্রমে ঢুকে প্রথমেই তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত। সব বিপদ কেটে যাবে। আশীর্বাদে তাঁর পরীক্ষায় ভালো ফল করবি। তোদের চড়চড়ে কপালে বিদ্যুৎ রেখা ভেসে উঠবে। তিনি মঙ্গলময়। যত বড়ো মাছই শিকার করি না কেন, তিনি আছেন সর্বত্র। তিনিই আমাদের হয়ে মাছটাকে দেখবি কবজা করে ফেলবেন। মাছ শিকারে আমাদের কোনো বিঘ্ন ঘটবে না।

ঢাইন মাছ ধরার উত্তেজনা তো আছেই, তার উপর ঈশা, আমি ঈশাই ডাকতাম–তুই তুকারিও চলত, তবে ঈশা আমার চেয়ে কিছু বড়ো। ঠাকুমা জেঠিমা সবারই এক অভিযোগ, তুই কীরে, তুই নাম ধরে ডাকছিস? ঈশাদি ডাকতে পারিস না। ঈশাদি বলত, নারে, তুই আমার নাম ধরেই ডাকবি। দিদিফিদি আমার ভালো লাগে না।

নিরাময়দা বললেন, তোর পিসির পাত্তা নেই, তোর ঈশাদিও আসছে না, কী ব্যাপার!

আসলে আমাদের সবারই আগ্রহ আছে ঈশার সম্পর্কে। পূজার ছুটিতে পিসেমশাই সবার জন্য জামাকাপড় নিয়ে আসেন। আজকাল ঈশাই নাকি সব পছন্দ করে কেনে। আমার ওপর বাড়ির সবাই একটু বেশি সদয়। কারণ পরিবারে আমি পিতৃমাতৃহীন। জেঠিমা কাকিমার আদরেই বড়ো হয়েছি। ঈশা এলে সে আমাকে ছাড়া কোথাও এক পা নড়বে না। আমার পিসেমশাইয়ের ঢাকা শহরের বাংলা বাজারে বিশাল গারমেন্টের দোকান। ঈশা তার বাবা-মায়ের সবেধন নীলমণি। তার আবদার কারও কাছে হেলাফেলার নয়।

আর আমি যে বড়ো হয়ে গেছি, বছর দুই আগে ঈশাই বুঝিয়ে দিয়েছিল। সে আমাকে ছাড়াবাড়িতে সাপটে ধেরে টকাস করে চুমু খেয়েছিল।

ঈশা সম্পর্কে নিরাময়দার আসল আগ্রহ, পূজার জামাকাপড় তিনি তার হাত থেকেই পেয়ে থাকেন। ঈশার পছন্দের তিনি খুব প্রশংসা করে থাকেন। ঈশাদির রুচি আছে এমনও বলেন। আর ঈশা যে রহস্যময়ী নারী হয়ে যাচ্ছে গতবারের পুজোয় তা ভালোই টের পেয়েছি। এই করে কেন যে মেয়েটার জন্য আমার এত টান—এবং কখনো মনে হয় আর কেউ না থাকুক ঈশা আছে। সে আরও কিছু চায় আমার কাছে। ঈশার কথা ভাবলেই মন খারাপ হয়ে যায়।

আসলে তরুপিসি ঠাকুমার পালিতা কন্যা। ঠাকুমার কোনো কন্যাসন্তান না থাকায় তরুপিসি এ-বাড়িতে আশ্রয় পান। এবং আমার বাবা-কাকারাই তরুপিসির বিয়েও দেন। এই তো সকালে ঠাকুমাই বললেন, পরের মেয়ে এত করে, তোমরা বউমারা কি তার জন্য এতটুকু ভাব! তারা আসছে না কেন, খোঁজখবর নিতে হয়। না!

বড়ো জেঠি বলল, আপনার ছেলে তো জানে। ডেকে জিজ্ঞেস করুন না।

হ্যাঁরে উপেন শুরু কবে আসবে। পূজার ছুটি পড়ে গেছে। ওদের কারও শরীর খারাপ হয়নি তো!

না না। ভালোই আছে। ঈশার পূজার ছুটি একটু দেরিতেই হয়। জান না!

আমাদের ছাড়াবাড়িটা প্রকৃতই নিঝুম। আট-দশ বিঘার ছাড়াবাড়িতে নানা ফলের গাছ। আম, আতা, লিচু, কাঁঠাল কী নেই! সফেদা গাছও আছে। খালের ধারে কিছু জঙ্গলও আছে আর আছে বড়ো বড়ো শিমুল, নিম, রসুনগোটার গাছ। কত রকমের যে গাছ! সুপারি গাছও মেলা। ঈশার বড়ো প্রিয় এই ছাড়াবাড়ি। বর্ষায় জলে ডুবে যায় জায়গাটা। ঈশার খুব সাঁতার শেখার শখ। সে আমাকে নিয়ে কিছু ভাবলেই তলব–

এই ছোড়দা চল। ছোটো ভাইবোনেরা ছোড়দা ডাকে। ঈশাও ডাকে—এটা তার আবদার।

কোথায়!

ছাড়াবাড়িতে। আমাকে সাঁতার শেখাবি।

ধেড়ে মেয়ে, আমি পারব না।

ওমা। ধেড়ে মেয়ে বলায় কী রাগ। ফুঁসে উঠেছে।

আমাকে তুই ধেড়ে মেয়ে বললি! ধেড়ে মেয়ে হলেই বা কি! ধেড়ে মেয়েরা কী সাঁতার শিখতে পারে না!

তা পারবে না কেন? আমি পারব না। বড়দাকে বল।

শোন ছোড়দা, আমাকে তোয়াজ করতে হলেও সে আমাকে ছোড়দা ডাকত।

বড়দাকে দিয়ে হবে না। সে কিছু জানে না। কিছু বোঝে না। কারও কালি আমার সহ্য হয় না। বড়দার এটা আছে।

জান বড়দা আমার চেয়েও সাঁতারে বেশি পটু।

কিন্তু ঈশা নাছোড়বান্দা, সে অগত্যা তার মাকে ডেকে বলল, দ্যাখ মা ছোড়দা আমাকে সাঁতার শেখাবে না বলছে।

আরে যা না। তোকে ছাড়া তো কোথাও নড়ে না। সাঁতার শেখাতে তোর আপত্তি কেন!

আপত্তি কেন, কী যে বলি। টুকুস করে চুমু খায়, বলে সাপটে ধর, ধর, আরও জোরে, আমাকে পিষে মেরে ফেলতে পারিস না। হস্তপদ নিয়ে গজ হয়ে গেছিস। কিছু কি তুই বুঝিস না। কিছু কি তোর নেই!

মেয়েটা এত ভালো, অথচ মাঝে মাঝে কী যে হয়। বাড়ির ভালো-মন্দ খাবার সে রান্নাবাড়ি থেকে তুলে এনে ঠাকুরঘরের পেছনে খাওয়ায়। বলে সব স্বার্থপর ছোড়দা। কেউ তোর কথা ভাবে না। বলতে বলতে সহসা ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে। সে গতবারে একটি ঝরনা কলম দিয়ে বলেছে, আমার জন্য মন খারাপ হলে চিঠি লিখবি কীরে লিখবি তো। আমার কত রকমের ইচ্ছা হয় জানিস। ভাবলে আমার নিজেরই লজ্জা লাগে। চল ছোড়দা। তারপর ফিস ফিস করে বলবে, আমি কিছু করব না। সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথা কেমন ঝিম ঝিম করতে থাকে। ছাড়াবাড়িটি সাঁতার শেখার পক্ষে প্রকৃষ্ট জায়গা। বর্ষাকালে কোমর জল থাকে। ডুবে যাবার আশঙ্কা থাকে না। ভাদ্র মাসে পুকুরে এক লগি জল, হাত ফসকে গেলে ডুবে যেতেই পারে। তার কথা ভেবেই শেষে রাজি হওয়া।

কিন্তু মুশকিল সাঁতার শিখতে গিয়ে তার বায়না—এই ছোড়দা আমার হিসি পেয়েছে।

নাম জলে। কেউ দেখতে পাবে না।

ভয় করে। তুই নাম।

কোষা নৌকায় ছাড়াবাড়িতে যেতে হয়। নৌকা থেকে অগত্যা জলে লাফিয়ে নামতে হয়। কীসের সাঁতার শেখা। সে জলে নেমে হুটোপুটি শুরু করে দেয়। আর আমার শরীরের সঙ্গে লেগে থাকতে চায়। আমার মধ্যে অপরাধবোধ কাজ করে। তবু কেন যে এক সময় তার কোমর ধরে বুকজলে দাঁড়িয়ে থাকি। আর তার যে কী হয়, সে আমার হাত ঠেলে আরও নীচে নামাতে গিয়ে কেমন অস্থির হয়ে পড়ে। তারপর কিছুটা বেহুঁশের মতোই বলে, আমি ডুবে যাব। তুই আমাকে জড়িয়ে ধর। আমি দিশেহারা হয়ে যাচ্ছি।

সে যেহেতু আমার জন্য এত করে, আমিও তার উত্তেজনা লাঘবের জন্য কিছুটা সাহায্য করি। এটাই ছিল ঈশার সাঁতার শেখার প্রক্রিয়া। ধীরে ধীরে সে সাঁতারও শিখে যায়। এবং বুঝতে পারি আমরা সত্যি বড়ো হয়ে গেছি। ঈশা আর আমার দিকে বাড়িতে চোখ তুলে তাকাতে পারে না। কথা বলতে পারে না। চোখের এই ভাষায় বড় হওয়ার কথা থাকে, তাও বুঝি। শরীরে ইচ্ছে অনিচ্ছে নানাভাবে বিচ্ছুরিত হতে থাকে। পূজার ছুটি হলেই তার আসার অপেক্ষা করি। এবারেও প্রায় তাই। দূরে দূরে সব জলময় মাঠ। কোনো ছই দেওয়া নৌকা দেখলেই ছুটে যাই। সময় কাটে না।

নিরাময়দা ঢাইন মাছ শিকারে নিয়ে না এলে এক ছন্নছাড়া মানুষের মতো বাড়ির ঘাটলায় চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া উপায় থাকে না।

সামান্য বড়ো হয়ে ওঠার মুখেই সে যে কী গন্ধ পেয়ে গেল আমার শরীরে। আমি হাটে যাব নিরাময়দা সঙ্গে—সেও আমার সঙ্গ নেবে।

খেলার মাঠেও তাই।

সুপুরি গাছে ওঠারও সাধ তার। প্রায়ই বলবে, তুই সঙ্গে থাকলেই আমার কেন যে এত হিসি পায়! প্যান্টিটা ধর। আমি সুপুরি গাছে উঠব। সুপুরি গাছে চড়া শিখব। সুপুরি গাছে সহজে ওঠা যায় না। কিছুটা উঠলেই হড়হড় করে পড়ে যেতে হয়। প্রকৃতই তার প্যান্ট ভিজা ভিজা থাকে।

কত ছবি হয়ে আছে সেই সব দৃশ্য কিংবা দুই বালক-বালিকা, পুজার সময় প্রকৃতির মধ্যে বড়ো হয়ে উঠছে—এক অষ্টমী পূজায় ঈশাকে কুমারী পূজাও করা হয়। এমন বন্য স্বভাবের মেয়ে যদি দুর্গা মণ্ডপে কুমারী সেজে বসে থাকে, তার পূজাআর্চা হয়, বড়ো বড়ো পদ্মফুলের সিংহাসনে এক দেবীকন্যা, কে বলবে তার মধ্যে পাক খাচ্ছে প্রকৃতির নানা কূটকামড়, পূজা আসলেই আমার এখনো মন খারাপ হয়ে যায়।

নিরাময়দা বলল, এসে গেছি।

আমাদের কোষা নৌকা খুব একটা বড়ো নয়। চারজন আমরা, নৌকা বড়ো হলে নদীর উজানে উঠে যাওয়া খুব কষ্টসাধ্য—নৌকা যত ছোটো হয়, ততই জলে নৌকা ভাসিয়ে নিতে সুবিধে। শত হলেও মাছে-মানুষে লড়াই কপালে থাকলে দু-মনি, আড়াই-মনি ওজনের মাছও লেগে যেতে পারে। পরিণামে নৌকাডুবি হয়। নদীর তরঙ্গে ভেসে কিংবা পাতালে অদৃশ্য হয়ে যাবার সম্ভাবনাও থাকে। ঠিক হয়ে আছে, রাতে আশ্রমে আহার

এবং ঠাকুরের ফুল বেলপাতার আশীর্বাদ, এবং ঠাকুমার সেই ট্যাবা, যিনি এখন নিরাময়দার পুণ্ডরীকাক্ষ অর্থাৎ বিষ্ণুর অবতার, তার অনুমতি নিয়ে ভোররাতে ভাটার মুখে জয় মা জগদম্বা বলে নদীর বুকে বড়শি ছুঁড়ে দিয়ে বসে থাকা। গভীর জলে বড়শিতে আরশোলা গেঁথে, সেই কোন গভীরজলে ছুঁড়ে দেওয়া।

তারপর গভীর জলের নীচে বড়শি আরশোলার টোপ নিয়ে অপেক্ষা করবে, এবং শুয়ে শুয়ে নৌকায় এই মাছ শিকার এক আশ্চর্য রোমাঞ্চকর ঘটনা। মাছে মানষে লড়ালড়ি, মাছ আটকে গেলে মাছে-মানষে খণ্ডযুদ্ধ। প্রবল সেই রোমাঞ্চ শরীরে শিহরণ খেলে যাবার মতো—ঈশার সেই সাঁতার শেখা কিংবা সুপুরি গাছ বেয়ে ওঠার মতো আশ্চর্য এক স্তব্ধতার অনুভূতি–

তখনই দেখলাম নদীর উত্তর-পশ্চিম কোণে এক প্রগাঢ় খণ্ডমেঘ উঠে আসছে। বর্ষাকালে প্রবল ঝড় হয়েই থাকে। বহু জনপদ ঝড়ের মুখে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। নিরাময়দা নৌকা থেকে নেমে যাবার সময় বলল ঠাকুরের কৃপায় মেঘ কেটে যাবে।

আমরাও লাফিয়ে নামলাম। দূরে আশ্রমের হ্যাজাকের আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিশাল এলাকার এই ডাঙা জায়গা খ্যাপা নদীর কোনো রোষই প্রত্যাঘাত করতে পারে না। অজস্র বৃক্ষ, এবং এক খণ্ড অরণ্যও বলা চলে, দূরে সেই মহাশ্মশানে আজ কোনো চিতার আগুন দেখা গেল না, ঠাকুর পুণ্ডরীকাক্ষ মন্দিরের গর্ভগৃহে জপতপে বসেছেন, নিরাময়দা কেমন প্রমাদ গুনলেন—আশ্রমের হরি ব্রহ্মচারী দেখাশোনা করছে সব। তিনিই মন্দিরের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেলেন।

আশ্রমবাসীর সংখ্যা যথেষ্ট। নানারূপে তাঁরা আছেন। ছোটো ব্রহ্মচারী, বড়ো ব্রহ্মচারীরা নানা কাজে ব্যস্ত। তাদের একজন হরিঠাকুর কী ভেবে বললেন, চলুন অতিথি ভবনে বসবেন। জপ তপ সারতে ঠাকুরের দেরি হবে। ভবনটি বিশাল, মাঘ সংক্রান্তিতে এখানে মেলা হয়। তখন দূর দূর অঞ্চল থেকে এমনকী ঢাকা শহরের গণ্যমান্য পুণ্যার্থীরা এসেও ওঠেন। জাগ্রত দেবী। তাকে অবহেলা করা যায় না। কোনো পাটের আড়তদার ভবনটি জগদম্বার নামে তৈরি করে দিয়েছেন। সারা অঞ্চল জুড়ে ঠাকুরের মেলা শিষ্য। মন্দির, অশ্বত্থাগাছ, অতিথি ভবন, আর নদীর বিশাল ঘাটলা তো আছেই। এই সব দেখে আমরা হতবাক, কলাপাতায় তখনই কিছু প্রসাদ চলে এল। প্রসাদ শেষ হতে না হতেই, ঠাকুর স্বয়ং হাজির।

আমার নাতিরা কই?

একেবারে নিকট আত্মীয়ের মতো সাদাসিধে সরল কথাবার্তা।

তারপর বললেন, দিদির নাতিরা আমারও নাতি। দেখি। আমাদের সামনে হাঁটু গেড়ে বসলেন।

জটাজুটধারী এবং শ্মশ্রুমণ্ডিত মানুষটিকে কেন যে আর ভয় থাকল না। খবর পেয়ে লীলাবতী ভৈরবিও হাজির। কই দেখি অচল ভোলা উমারে।

যেন কত কাল আমাদের দেখার জন্য প্রতীক্ষায় ছিলেন। শেষে যে বিনোদিনী দিদি রাজি হয়েছেন, কারণ লীলাবতী বংশের কলঙ্ক, এমনও শুনেছি সামাজিক বাধানিষেধ অগ্রাহ্য করে বিধবা লীলাবতী এক কাপড়ে ট্যাবা ভট্টাচার্যের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ায় বংশের মুখে

কালি পড়ে এবং সেই থেকে বিনোদিনীর পরিবার এবং তাঁর আত্মীয়স্বজন পারতপক্ষে এই আশ্রমের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতে চায় না। লীলাবতী মরে গেছে এমনই চাউর হয়ে গেছিল।

সে যাইহোক, বলতে গেলে অনেক কথা হয়।

তিনি অর্থাৎ পুণ্ডরীকাক্ষ ঠাকুর বললেন, নদীতে তো ভাই তোমাদের যাওয়া হবে। উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে অতিকায় কালো মেঘে নদী আবৃত হয়ে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই নদী ঝড়ে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যাবে। বহু প্রাণহানির আশঙ্কা আছে। নদী শান্ত না হলে তোমাদের ছাড়া যাবে না।

শত হলেও নিরাময়দার পুণ্ডরীকাক্ষ ঠাকুর বাকসিদ্ধ পুরুষ। তার কথাই শেষ কথা।

নিরাময়দা ঠাকুরের পাশে হাত জোড় করে বসে আছেন। শুধু ওঠার মুখে নিরাময়দা বললেন, যে আজ্ঞে বাবাঠাকুর। আর তখনই বাবাঠাকুর খুবই যেন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে বললেন, ঈশা নারানগঞ্জের স্টিমারে রওনা হয়েছে অথচ স্টিমারের কোনো পাত্তা নেই। ঝড় কি নদীর মুখে শুরু হয়ে গেল।

তখনই বিদ্যুৎ চমকাল। কোথাও বাজ পড়ল, আর প্রলয় শুরু হয়ে গেল যেন। মহাপ্রলয় কাকে বলে। নদীর জল আশ্রমের ঘাটাল পার হয়ে অতিথিভবনের সিঁড়িতে ঢুকে গেল। এবং নদীর তরঙ্গমালায় নানাপ্রকারের বিদ্যুৎলতা সাপের ফণা তোলার মতো ভেসে যেতে লাগল। নদীর জল ফুলে ফেঁপে উঠছে। আর শোঁ শোঁ আওয়াজ। জানালা-দরজা বন্ধ।

চারপাশে অন্ধকার নিস্তব্ধতা। ঈশা স্টিমারে রওনা হয়েছে–আমার ভেতর তোলপাড় শুরু হয়ে গেল ঈশার কথা ভেবে।

নিজের ভিতর নিজেই ছটফট করছি।

আমার পিসেমশায় হয়তো আশ্রমে খবর পাঠিয়েছেন, তাঁরা স্টিমারে রওনা দিয়েছেন, কারণ পূজার ছুটিতে কিংবা ঈশা যদি অন্য কোনো ছুটিছাটায়, অথবা বাড়ির কোনো উৎসবে, কারুর বিয়ে, অন্নপ্রাশন, বাস্তুপূজা এবং নানাবিধ পূজা সহযোগে উৎসব লেগেই থাকে। পিসেমশাই আসতে না পারলে পিসিমা ঈশাকে নিয়ে চলে আসবেনই, সঙ্গে বিশ্বস্ত কোনো কর্মচারী এবং আশ্রমের ঘাটে স্টিমার নোঙর ফেললে মন্দির দর্শন, ঠাকুরের পায়ে প্রণিপাত এবং রাত্রিবাস করে ফের সকালের নৌকোয় রওনা হওয়া।

ঈশার বন্য স্বভাবের কথা মনে পড়ছে।

মেয়েটা বলত, তুমি আমার ভালো না বাসলে একদিন দেখবে আমি মরে যাব।

কেন মরবি? মরা কি এত সহজ?

ঠাকুর তো বলেছে, আমার মৃত্যু জলে ডুবে।

আজেবাজে কথা একদম বলবি না।

বলেছে বলছি।

কেন বলল। তুই কী করেছিলি! তুই তো সাঁতার জানিস?

সে দিনও মেঘনায় সাঁতার কাটছিলাম। বাবার কী মানত ছিল! দুদিন তিনি আশ্রমে ছিলেন। পাঁঠাবলি হবে শুনে, আমার রাগ, পাঁঠাবলি কেন?

ঠাকুর খুবই কুপিত।

শোনো ঈশা, সবই মা জগদম্বার ইচ্ছা। তিনি যা চান দিতে হয়। গোলমাল করে পূজার বিঘ্ন ঘটিও না।

কে শোনে কার কথা।

ছাগ শিশুটির আত্মরক্ষার্থে কোলে নিয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। বৈশাখ মাস, নদীতে হাঁটু জল। নদীর ওপারের চরে ছেড়ে দিয়ে এসেছিলাম। জল থেকে উঠে আসার সময় কুপিত হয়ে বললেন, নদীর জলেই তোমার মরণ ঈশা। মা জগদম্বার ইচ্ছার বিরোধী তুমি। তোমার জন্য আমার নিজেরই কষ্ট হচ্ছে। মুখ থেকে কথাটা কী করে যে ফসকে বের হয়ে গেল।

আমি বলেছিলাম, কচু হবে দেখিস!

তারপরও কিছু করণীয় থাকে।

এবং বাকসিদ্ধ মানুষের এই এক বিড়ম্বনা। কুপিত অবস্থায় একরকম, মন শান্ত হলে অন্যরকম। অনুশোচনায় মাথা খারাপ হয়ে যায় ঠাকুরের। সবই অমোঘ ঈশ্বরবিশ্বাস হেতু। তিনি জানেন তাঁর কথা মিথ্যে হয় না। তিনি দিনের পর দিন অনশনে থাকলেন। মা জগদম্বাকে তুষ্ট করার জন্য হোমের আয়োজন, সারা দিন উপবাস থেকে সেই হোমে

অপাবৃত অবস্থায় মন্ত্র উচ্চারণ করালেন ঈশাকে দিয়ে, অঘোরমন্ত্রে দীক্ষিত করালেন, বাক্যদোষ খণ্ডনে শাস্ত্রমতে যা যা করণীয়, কিছুই বাদ দিলেন না।

ঈশা-ই তাকে সব খুলে বলেছে।

ছোড়া কাউকে বোলো না। বললে মন্ত্রশক্তি নষ্ট হয়ে যায়।

তখনই ঝড়ঝাপটা আর বজ্রপাতের মধ্যে নদীর মাঝখানে স্টিমার চরায় ঠেকে গেছে। আশ্রমের পাশেই হাট, এবং মাছ ধরতে আসা সব নৌকাই ডাঙায় তুলে দিয়ে সবাই এসে আশ্রয় নিচ্ছে আশ্রমে, আর তখনই স্টিমার থেকে বার বার আর্তনাদের মতো ভোঁ ভোঁ আওয়াজ। ভয়ঙ্কর বিপদসূচক বার্তা পাঠাচ্ছে। কেউ স্থির থাকতে পারছে না। ঠাকুর শুধু বললেন, প্রলয়কালে এমনই হয়ে থাকে।

তারপর তিনি, আরও যারা ঝড়ের আতঙ্ক থেকে আত্মরক্ষার্থে আশ্রমের ঘাটে উঠে এসেছিল তারা—নিরাময়দা তো আছেনই, টর্চ হাতে আশ্রম থেকে নেমে গেলেন। জীবন বাজি রেখে আমরাও নেমে গেলাম। আর চারপাশে টর্চ জ্বেলে খুঁজতে থাকলাম, কোনো জলে ডোবা মানুষ যদি নদীর পাড়ে পড়ে থাকে।

নদীর পাড় অনতিক্রম্য। এখানে সেখানে সব গাছপালা পড়ে আছে। ডাল পাতা সব বেগে ধেয়ে যাচ্ছে। ঠাকুর কেবল মা জগদম্বার নাম নিচ্ছেন। তুমিই অগতির গতি। স্টিমারের আলো নিভে গেছে, অন্ধকারে বোঝাই যাচ্ছে না, নদীর কোন চরায় স্টিমারটা আটকে গেল। বিদ্যুৎ চমকালে বোঝা যাচ্ছে, যাত্রীরা প্রাণ হাতে তরঙ্গসঙ্কুল নদীতে ঝাঁপ দিচ্ছে। আর তখনই নিরাময়দা এবং আর কেউ কেউ, এমনকী আমরাও আশ্রমে উঠে

এসে নদীতে নৌকা ভাসিয়ে দিলাম। আমার মাথা খারাপ অবস্থা—ডাকছি ঈশা, ঈশা, আমরা নদীতে আছি, তুই কি স্টিমারে? ঈশা, ঈশা। নিরাময়দার চিৎকার থাম থাম। ওই দ্যাখ ভেসে যাচ্ছে, আমরা এক এক করে তুলছি, আর আশ্রমে এনে শুইয়ে দিচ্ছি। জীবিত, মৃত কেউ বাদ যাচ্ছে না। এতগুলি নৌকা একসঙ্গে উদ্ধার কার্যে নামলে যা হয়, ঈশার কথা কেউ আর মনে রাখে না।

ঝড়ের প্রকোপ কমে আসছে।

কিছু মানুষজন সাঁতরে পাড়ে উঠে আসছে।

বৈদ্যেরবাজার থেকে থানার দারোগাবাবু সব সেপাইদের নিয়ে ত্রাণের কাজে নেমে পড়েছেন। বড় টর্চের আলোয় নদীতে জলে ডোবা মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছে তারা। আর আমি পাগলের মতো এক নৌকা থেকে আর এক নৌকায় লাফিয়ে পড়ছি। আর ডাকছি, ঈশা। ঈশা। তুই কোথায়! আর নানা প্রশ্ন, পিসিমা, পিসেমশাই এল না কেন? একা চলে এলি! তোর সঙ্গে আর কে আছে?

নিরাময়দা সারেঙকে হুইলঘরে পেয়ে গেছেন। ডেকছাদে তাঁরও ছোটাছুটি কম না। জনে জনে লাইফবেল্ট লাইফ বয়া দেওয়া, শিশু, নারীকে আগে বোটে পার করে দেওয়া, তাঁর লস্করদের নিয়ে তিনি এখানে সেখানে কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, ঘুটঘুটে অন্ধকারে কিছু বোঝাও যাচ্ছে না। নিরাময়দার গলা পাওয়া যাচ্ছে।

সারেঙসাব ঈশাদির আসার কথা, সে কোথায়?

সারেঙসাব আর্তগলায় বললেন, ঈশাদি কথা শুনল না। চরায় ধাক্কা খেয়ে স্টিমার দু-টুকরো। কে কোথায় ডুবেছে, কী ভেসেছে—জানি না। নদীর কঠিন তরঙ্গ দফে দফে ডেকছাদ সাফ করে নিয়ে গেছে। তরঙ্গ উঠে আসার ফাঁকে ছোটাছুটি করছি, ঈশাদির সঙ্গে গগন এসেছে।

গগন পিসেমশায়েরই বিশ্বস্ত কর্মচারী, প্রৌঢ় মানুষ।

কোথায় গেল!

ঝড়ের মধ্যেই খ্যাপা নদীতে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ঈশাকে সারেঙসাব চিনতেই পারেন। কেবিনের যাত্রী ঈশা। ডেকছাদে মাত্র তিনটে কেবিন। সব কেবিনগুলোর দরজাই ফাঁক হয়ে আছে। আর কড় কড় শব্দ উঠছে। সব কেবিনগুলিতেই উঁকি দিলাম, সব ফাঁকা।

সারেঙসাব ছুটে এসে বললেন, ঈশাদি আমার বলল, আমি সাঁতার জানি। এই তরঙ্গসঙ্কুল নদীকে সে ভয় পায় না। সামনের আশ্রমে ঠিক সে উঠে যেতে পারবে।

হায় কপাল, তালগাছ প্রমাণ সব ঢেউ, ঈশা তো জানে না তাকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। সে কারও কথা শোনার বান্দা যে না আমিও বড়ো হতে হতে কতবার টের পেয়েছি। ছোটোদাদু আমাদের দুজনকে একসঙ্গে দেখলেই ফোকলা দাঁতে হাসতেন।—এই দুপুরের রোদে কোথায় যাওয়া হচ্ছে। তোর মাকে ডাকছি ঈশা।

ডাকো না। সঙ্গে ছোড়দা আছে।

ভিতরে প্রাণসৃষ্টির মধুমালা কুব কুব করে ডাকছে যে, কে আর আটকায় দিদি তোকে।

ইশা তাকায় আমার দিকে।

আমিও। তারপরই ঈশা ছুটে আমার সঙ্গে উঠে যেত ছাড়াবাড়িতে। ছোটোদাদু বলতেন, প্রাণসৃষ্টির পুঁথির পাতাটি খুলে গেছে, কী মজা!

এই সব কথাই মনে হচ্ছিল। ভিতরে হায় হায় করছিলাম। আমি ডাকছি, ঈশা, ঈশা। ঈশাকে খুঁজে পাওয়ার জন্য পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম। ঈশার নানা উপদ্রব আমার কাছে এখন জীবনের মাধুর্য। আমি তখন আর এক খ্যাপা। তরঙ্গ উঠে আসছে নদীর। নৌকার চেয়ে এই তরঙ্গমলায় ভেসে যাওয়া সহজ।

সব তরঙ্গই নদীর কিনারে আছড়ে পড়ছে।

আর আশ্রমে উঠেই শুনলাম, কিছু জলে ডোবা মানুষকে তুলে আনা হয়েছে। কেউ মৃত কেউ অর্ধমৃত। সমস্ত আশ্রম জুড়ে মানুষের কান্না এবং কোলাহল। সব ডে-লাইট জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঈশাকেও পাওয়া গেছে। নিরাময়দা বললেন, ঈশাকে মন্দিরের বারান্দায় শুইয়ে রাখা হয়েছে। মাথায় তুলে হরি ব্রহ্মচারী তাঁকে ঘোরালেন। কিছুটা জল উগলে দিল। তারপর নিস্তেজ। ঠাকুর পুণ্ডরীকাক্ষ তার নাড়ি ধরে বসে আছেন। আর কালীস্তোত্র জপ করছেন। তোরা গিয়ে ঈশার পাশে বোস। আমার দিকে তাকিয়ে নিরাময়দা সতর্ক করে দিলেন, পাগলামি করিস না। সব ভবিতব্য। ঈশার শিয়রে শান্ত হয়ে বোস। আমি বাড়ি যাচ্ছি খবর দিতে।

এক সময় পুণ্ডরীকাক্ষ ঠাকুরও উঠে গেলেন। লীলাবতী ঈশাকে জড়িয়ে হাউ হাউ করে কাঁদছে। সাদা কাপড়ে ইশার শরীরও ঢেকে দেওয়া হল। আমি ঈশার শিয়রেই বসে আছি। কখন যে দেখি পাশে কেউ নেই। ঝড়ে সাদা কাপড় উড়িয়ে নিয়ে গেছে। কে বলবে, ঈশার সব শেষ, সে তো ঘুমিয়ে আছে, ফ্রক গায়ে দিয়ে ঘুমিয়ে আছে। ঈশার সেই মধুমালা কোথায় গেল? ডাকলে সেই প্রাণের সাড়া পাওয়া যাবে না। কিংবা সাপটে ধরলে। কেউ তো নেই। সব আশ্রমের বিশাল প্রাঙ্গণে, নদীর পাড়ে উদ্ধার কাজে ব্যস্ত।

প্রাণের সাড়া যদি পাই। আমি তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলাম নির্জন বারান্দায়। উষ্ণতা সৃষ্টি হোক, সে ভিতরে জেগে উঠক। তারপর আরও নানা চেষ্টা, না, সাড়া নেই। আমি তার মুখের উপর ঝুঁকে ডুকরে কেঁদে উঠলাম। আমার দু-ফোঁটা অশ্রুবিন্দু তার চোখের পাতা ভিজিয়ে দিতেই সে যেন জেগে গেল। সে চোখ মেলে তাকাল। সে এক আশ্চর্য বিস্ময় ভরা চোখে আমাকে দেখছে।